ছোটোগল্পে মেদিনীপুর ঃ দুই গল্পকার

ঋিজিৎ পান্ডা

এক ,

সাহিত্যে, বিশেষত কথা সাহিত্যের অস্তিত্বে মিশে আছে আঞ্চলিকতা । উপন্যাস ছোটগল্পের পটভূমি পরিবেশ তৈরী হয় একটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে ঘিরে । এর মানে এই নয় যে , একটি লেখায় একটিমাত্র অঞ্চল থাকবে । পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল , এমনকী ব্রহ্মান্ডলোকের পটভূমিতে গ্রথিত হতে পারে একটি ছোটগল্পের জমি । কথা সাহিত্যের প্রাথমিক শর্তই পটভূমি — পরিবেশ — অঞ্চল । বিভিন্ন লেখকের লেখায় খুঁজে পাই বিভিন্ন অঞ্চলকে । কখনো পটভূমি হিসেবে, কখনো অলংকরণ হিসেবে, আবার কখনো বা বিষয়রূপে ধরা পড়ে এই অঞ্চল । কারো কারো লেখায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল তার সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদগ্র হয়ে থাকে । যেমন , তারাশঙ্করের লেখায় বীরভূম, শরৎচন্দ্রে হুগলী, ডিকেন্সে লন্ডন, হেমিংওয়ের লেখায় কিউবা..... বাংলা কথা সাহিত্যে মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে কারো কারো লেখায় । তাঁদের কেউ কেউ জন্মসূত্রে মেদিনীপুরের । কেউ বা কর্মসূত্রে মেদিনীপুরে বসবাস করছেন, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। লেখালিখির সময় সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের উত্তরে উড়িষ্যা, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। এদিক থেকে বলতে পারি, তিনটে প্রাদেশিক ধারার মিলনক্ষেত্র এই জেলা। সুবর্ণরেখা কাঁসাই শিলাই কেলেঘাই রূপনারায়ন হলদী রসলপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নদী ব'য়ে গেছে এই জেলার উপর। মেদিনীপুরের উত্তর—পশ্চিমের প্রস্তর ভূ প্রকৃতিতে শাল মহুয়ার অরণ্য। পূর্ব দক্ষিণের কোমল ভূমি আম জাম কাঁঠালে ভরা উর্বরক্ষেত্র। মেদিনীপুরের এক প্রান্তে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ ভারতের প্রবেশপথ। দক্ষিণপূর্ব রেলের বিস্তার এরই উপর দিয়ে। কৃষি—নির্ভর এই জেলার নববই শতাংশই গ্রাম। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সম্প্রতি পূর্ব ও পশ্চিম দুটি ভাগে এই জেলা বিভক্ত হয়ে গেছে। আমার এই আলোচনায় অখণ্ড মেদিনীপুরের কথা মাথায় রেখেছি।

সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শু করে অধুনা বীরেন মাইতি অনিল ঘড়াই নলিনী বেরা ভগীরথ মিশ্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বিনোদ মণ্ডল প্রমুখের লেখায় মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল মানুষজন সংস্কার রীতিনীতি জলবায়ু আঞ্চলিক স্বাধর্ম্য নিয়ে প্রকাশিত। এর মধ্যে দু'জন লেখকের ছোটোগল্প নিয়ে আলোচনা এই নিবন্ধে।

দুই,

এখানকার উল্লেখযোগ্য কথা সাহিত্যিক অনিল ঘড়াই এর ছোটোগল্প মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দক্ষিণ—পূর্ব রেলওয়ের সেকশান ইঞ্জিনিয়ার অনিলকে কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়েছে, থাকতে হয়েছে, তাই তঁার লেখার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন অঞ্চল দেখা যায়। কিন্তু অনিলের অধিক দুর্বলতা বোধহয় জন্মভূমি মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ভূপ্রকৃতি, মানুষ উদগ্র হয়ে আছে তাঁর গল্পে—উপন্যাসে।

জেলার পূর্ব—দক্ষিণে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগর। এই সামুদ্রিক পটভূমিতে অনিলের অনেকগুলি গল্প বিধৃত। এই সকল গল্পে

সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের আঞ্চ লিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে । যেমন, 'সমুদ্র কাঁকড়া' গল্পটি। সমুদ্রতীরে কাঁকড়া ধরে জীবন অতিবাহিত করা মানুষদের ছবি ফুটে উঠেছে এ গল্পে। কাঁকড়া ধরার পদ্ধতি, বিপদ, কাঁকড়ার বিভিন্ন প্রজাতি ইত্যাদি নান া অনুষঙ্গ এসেছে প্রাসঙ্গিক ভাবে। কেন্দ্রীয় চরিত্র গুয়ারামের " হাতে কাঁকড়া ধরার শিককাঠি। বেতবোনা খালুই, কে ামরে কোচান গামছা গুয়ার বউ তিলাও বেরিয়ে পড়ে কাঁকড়ার খোঁজে। তার হাতেও শিককাঠি, খালুই আর নাইলন সুতোর ছোট জাল।" খালুই আর শিককাঠিটা ঢুকিয়ে দিল কাদা বালিতে। কাঁকড়ার ঘরবাড়ি সব অন্যরকম। অভিজ্ঞ চে াখে দেখে নিতে দেরি হয় না তিলার। একদম পাড়ের কাছাকাছি, সামান্য জল কাদা বালিতে গা লুকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থ াকে দশদাঁড়ার মাণিক। খুব ভালভাবে দেখলে নজরে পড়বে বুড়বুড়ির শব্দ। তার মানে নিশ্বাস নিচ্ছে মক্কেল। থিতিয়ে থাক া জলে বুদবুদ গুলো উপরে উঠেই ফেঁসে যায়। তখন একদম নিশ্চিত শিক চালিয়ে দেওয়া, যত দূর যায় ততদূর। একসময় খোঁচায় তিতিবিরক্ত ক্রুদ্ধ দাঁড়া চেপে ধরে শিক। দু' হাতে তখন বালি সরিয়ে দাঁড়া চেপে ধরে সরাসরি খালুই-র অন্ধকাব গহ্বরে। তখন বাপুর ছটফটানি দেখে কে! যেন কেটে ফেলবে খালুই, ছিটকে হানা দিয়ে এগিয়ে যাবে নীল জলে। তখন ত ার দাঁড়ার শক্তি যেন ইন্দ্রের বজ্রের শক্তি।" এইভাবেই সমুদ্রে কাঁকড়া খোঁজা চলে।

'সমুদ্রে' গল্পের কেঁচুর জীবিকা মাছধরা, নোনামাছ বাড়িবাড়ি গিয়ে বিক্রিকরা। কিন্তু এতো করেও মাত্র দুটো প্রাণীর পেট চলে না। কেঁচুর বউ ঢেঁড়িকে যেতে হয় মাছ বাছতে, হোটেলের বাসি খাবার আনতে। এই মানুষদের কাছে সমুদ্র বড় প্রিয়, মমতাময়ী সমুদ্রই তাদের তাদের আশা ভরসা — প্রাণ ধারণের শক্তি। কেঁচু তার প্রিয় চেনা' অনন্তনীল, নীল প্রতিবিম্বিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে " ঢেঁড়ি একদিন পর হয়ে যাবে কিন্তু এই সমুদ্রতীর, বালিয়াড়ি, বিস্তীর্ণ জলভূমি সব তার নিজের হয়ে থেকে যাবে।" সমুদ্রে লালিত এই মানুষদের সংস্কার-বিশ্বাস আশা- আকাঙ্খা খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে এ গল্পে। কেঁচু একটি সন্তানের জন্য চন্দনেশ্বর মন্দিরে হত্যে দিয়েছিল। চন্দনেশ্বরের প্রতি অচলভক্তি, হত্যে দেওয় া, মানত করা মেদিনীপুরের গ্রামজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'বালিয়াড়ি' গল্পের পটভূমিও সমুদ্র সৈকত। এক পাগলের কণ কাহিনী এ গল্পের বিষয়। বালিয়াড়ি পাগলের ঘর-দোর, ব ালিয়াড়ি তার প্রিয়তমা নারী। — " গত রাতের বৃষ্টিতে বালি ভিজে আছে জলকুমারীর মতো। মাঝে মাঝে তার মনে হয় এই বালিয়াড়ি বুঝি নাঙ্গা হয়ে শুয়ে থাকা কোনও মেয়ে। পাগল তার উপর শুয়েছে। শিরশিরান উত্তেজনা। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠত উন্মাদনায়। সাবুদানার মতো ঘাম ফুটত শরীরে। পাগলার মন করত হয়ে নাঙ্গা হয়ে উদোম আকাশের নীচে শুয়ে পড়তে। সে শুত। আদর করত ভেজা বালিয়াড়িকে। পুষাঙ্গের চাপ দিত নরম বালিতে আঃ কী যৌন সুখ!" বেড়াতে আসা বিদেশিনী, জেলেদের ফেলে দেওয়া টেপা মাছ ইত্যাদি সমুদ্র সৈকতের বিস্তৃত চিত্র প্রকাশিত এ গল্পে। এসেছে চড়ায় এসে আটকে যাওয়া মরা হাঙরের প্রসঙ্গও, যাকে দেখার জন্য হুমড়ে পড়েছিল হাজার হ াজার দর্শনার্থী।

সমুদ্র উপকূল এলাকার আর এক দৃশ্য 'ডাঙার দিকে' গল্পে। এখানে তালসারি-বুড়িডাঙ্গা-সাতমাইলের চর এলাকা পটভূমি হিসেবে এসেছে। নদীতে বালিতোলার কাজ করা জলমুনিশের জীবনচিত্র এ গল্পে। নৌকায় বালি তোলার বিস্তৃত বর্ণনা, জলমুনিশদের ঝুঁকি ও দুর্দশার নানা প্রসঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে গল্পে। "চরণ লগা ঠেলছিল নৌকোর, কম জলে লগা হল নৌকার পা। লগার তোড়ে জলের ওপর উড়ুলমাছের মতো পিছলে যাচ্ছিল নৌকো, সেই সঙ্গে ফুলে উঠছিল চরণের হাতের পেশী, পরনের লুঙ্গিটায় হাওয়া ঢুকে বেকায়দা অবস্থা। ..... বালি নৌকার মাঝখানে গোল হয়ে বসে অ াছে গুণটানার দু-জন মজুর। ফেরার সময় ভরা নৌকো মাঝ গাঙ দিয়ে যাবে না, এই ছ-জন মজুর হল জোগালি। বালতি তোলা আর ফেলার বাহাদুরি নেই, তবে নজর-মাপ-আন্দাজ দরকার। .....পটাই লম্বা বাঁশের ডগায় লোহার বালতি বেঁধে তড়িঘড়ি ছুড়ে দিল জলের গভীরে, তাকে দেখে এগিয়ে এল ভজন। পটাইয়ের হাত থেকে বাঁশ বালতিটা নিয়ে সিঁধিয়ে দিল জলের তলায়। তারপর, দক্ষ হাতে নারকেলের সাঁস চাঁচার মতো চেঁচে নিল বুড়িগাঙের বালি। লগা চা গিয়ে সাবধানে টেনে আনল বালি বোঝাই বালতি।" জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এত কষ্ট করে বালি তুলতেও জলমুনিশদের দা

রিদ্র ঘোচেনা। একটা লুঙ্গি কিনতে পারে না ভজন। পটাইয়ের মাথা তেলহীন থেকে যায। আর জলে না নেমেও ফুলে ফেঁপে ওঠে মালিক কানাইবাবু।

এগরা থানার দাউদপুর ক্ষিনীপুর এরান্দা নানকা হাতীদা প্রভৃতি গ্রামগুলির পটভূমিতে লেখা 'পরীযান' গল্পটা ইদানিং মেদিনীপুরের গ্রামগুলিতে যাওয়ার জন্য মোরাম রাস্তা হয়ে গেলেও কয়েকবছর আগে এই সুবিধা ছিল না। বাসরাস্তা থেকে যাতায়াতের পথ ছিল মাটির । বর্ষাকালে তো বটেই অন্যান্য সময়েও বাস-ট্যাক্সি প্রবেশ করতে পারত না স মেঠো পথে। বিয়ের পাত্র-কন্যা যেত পালকিতে । আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে পরীযান-এ। এই পরীযানকে কেন্দ্র করে মানুষের শখ-আাদ দুঃখ-দুর্দশার কথা বলেছেন লেখক পরীযান গল্পে। আর্থিক দৈন্যের জন্য হাণ্ডরিদের পরীযান বিত্রি করতে হয়েছে সুরেন জানার কাছে। এখন "না খেতে পাওয়া মেয়ে বড় লোকের ঘরে বিয়ে হলে যেমন হয় তেমনি দশা হয়েছে পরীযানের সাজ-গোছ একেবারে রাজরানীর মতো। সামনে সিল্কের ঝালর, দু'ধারের হাতলে রবপালি পাত। হাতির শুঁড়ের মতো বেঁকানো। তাতে ফুল-লতাপাতা আঁকা। পুরো শরীরেই সোনালী রং, তার মধ্যে পালি ছিটে। পাশ খোলা দু'দরজা। নক্শা কাটা শাটিং এর পর্দা সরিয়ে দিলেই ভেতরটা একেবারে তালশাঁসের চেয়ে ফর্সা। দরজার উপরে প্লা ষ্টিকের লিচুফুল আর রকমারি সাজ। চারধারে রং-বেরং-এর পুঁতির ঢেউ। চকমকি কাঁচ আঁটা কাঠের গায়ে গায়ে। রঙ্গি লা শাড়িপরা মেয়ের চেয়েও সুন্দর দেখায় পরীযানকে।" এ হেন পরীযান এ গ্রামে বহুদিন যায় নি। সামর্থ্য নেই। তাই পরীযান দেখতে ছুটে যায় গ্রামের মানুষজন-বউ-ঝিরা। ছ'বেহারা হাতপা ছুঁড়ে গলায় অশ্লীল সুর তুলে চলেছে ঃ "চাল ভ াজা তিলে খাজা/বর্ষা রাত বৌয়ের হাত/ হেই আ হো-ও হৈ আ হৈ-ই-ই হা-হো-ও-ও-ও ..... " শুধু পরীযান নয় বড়লোকদের বিয়েতে ব্যান্ডপার্টি বাজিপোড়ানোর প্রসঙ্গও এসেছে এ গল্পে।

এগরা সাতমাইল কাঁথি পানিপাল রামনগর — এই বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিতে অনিল অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। 'ফুল ও পাথরের গল্পের' শুতেই চিহ্নিত করা হয়েছে নির্দিষ্ট অঞ্চলকে — " ভিড়ে ঠাসা বাসখানা যখন সাত মাইল খালের প াকার পোলের উপর দাঁড়াল তখন সমুদ্রগামী অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে নীচের খাল দিয়ে।" গ্রাম্যবধূ প্রভাতী ও দায়া হ াসপাতাল ভর্তি থাকা তার অসুস্থ স্বামী বনমালীর দুর্দশার কণ মর্মান্তিক কাহিনী এ গল্প। সেই সঙ্গে সুযোগ সন্ধানী প্রতিবেশীদের হিংস্র শত্রুতার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। পাশের বাড়ির চৈতন্য " গোপনে বনমালীর ঝড়ের বঁ াশকেটে চড়া দামে দেয় ডোম পাড়ায়। আর কায়দা করে সেই কাটা বাঁশের তাড়ায় লেপে দেয় পুকুরের পচা পাঁক। দূর থেকে কেউ যাতে টের না পায় সেইজন্য শুকনো বাঁশপাতা সেই ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে দেয়।..... চৈতন্য ধানে দেওয়া কীটনাশক ঢেলে দিয়েছে পুকুরের জলে। পুকুরের মাছ সব ভেসে উঠেছে বিষ জল পান করে এতেই ক্ষান্ত হয় না সে। প্রতিবেশীর শত্রুতা এ গল্পে সকল সীমা অতিত্রম করেছে। নিঃসন্তান চৈতন্য মথুরা দুজনে মিলে প্রভাতী-বনমালীর শিশুসন্ত ানকে খুন করে। কাঁথি শহর ও হাসপাতালের বর্ণনা গল্পে এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে।

'নাকছাবি' গল্পে এসেছে পানিপালের চম্পানদী ও সংলগ্ন গ্রামীণ পরিবেশ। "ধান মাঠ এখন সবুজ গালিচা। তার ভেতরে হুটোপুটি খেলা করে ভাদ্রের ঘোলা জল। এই জলে শোলবুড়ি ঘুরে বেড়ায় ছানা-পোনা নিয়ে। ভাদ্রের রোদ গায়ে না ম াখালে বাড়-বাড়ন্ত হয় না। তাই এই মাঠ ভ্রমণ। ...শাসমলদের ধান খেতে জল বেশি নেই। কালিয়া কাঁকড়া ডিম ছেড়েছে আলের আড়ায়। দাঁড়ে করে জড়ো করেছে নরম মাটি।" ধানক্ষেতের বর্ষাকালীণ চিত্র। এলাকার মানুষজনের জীবন য াপনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চম্পা নদী,"উঁচু বাঁধ আটকে রেখেছে চম্পানদীর জল। শরৎ এর এই সময় জলের বেশ তোড় আছে। ঘোলাজলে আকাশ এখন মুখ দেখে না, অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নদীর পাড়ে কত রকমের গাছপালা। জল পেয়ে চকচক করছে পাড়গুলো।" অনিলের অধিকাংশ গল্পের মতো এ গল্পেও ভীড় করেছে অন্ত্যজ মানুষেরা। তাদের দরিদ্র জীবনযাপনের খুঁটিনাটি ধরা রয়েছে এ গল্পে। হীরালালের নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই। শীত কালে নোনা মাছ বিত্রী করে। পূজোর সময় ঢাক বাজাতে যায় টাটানগর সিনি চত্রধরপুর। "ফি বছর চিঠি আসে ওখানে থেকে প্যান্ডেল ধরা অ াছে। ওরা ঢাক বাজায় দূর্গা মায়ের সামনে। ওদেশে নাকি ঢাকির বড় অভাব। যারা আছে তাদের বাজনাও নাকি এখানক

ার মতো নয়। ফলে মোটা টাকা পায় হীরালাল। লক্ষ্মীপূজো পার করে এলে দুমাসের খোরাকী উঠে যায়।" এদের শখ বলতে রেডিও শোনা; হাতে টাকা থাকলে পয়সা দিয়ে তাস(জুয়া) খেলা। নিজেরা খেতে না পেলেও অতিথি এলে হোটেল থেকে মাছ এনে খাওয়ায়। দরিদ্র হলেও আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। এই ঐতিহ্যই চিনিয়ে দেয় গ্রামকে। দরিদ্র মানুষগুলোর জীবন্ত দলিল এ গল্প।

মেদিনীপুরের বালিঘাই-সাতমাইল অঞ্চলে অজস্র ইটভাটা চোখে পড়ে। অনিলের বহুগল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে এই অঞ্চল তার সকল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। যেমন সারেঙ্গি শিল্পী সুদামা কুঙ্কলের গল্প 'আকাশ মাটির খেলা' - তেঃ "খোলা আকাশের নীচে এঁটেল মাটির পাহাড়, পোড়া ইট সাজান থরে থরে, ছোটো খালের পাশ দিয়ে বাবুদের বিশাল ইটভাটা। শেষ হলেই ধানমাঠের শু, ... কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুদামা কুঙ্কল গান গায় আর পা দিয়ে মাটি ছানে। খালের জল কলকলিয়ে ছুটে যায় জোয়ারের টানে, জোয়ারের শব্দ তার বুকেতে আছড়ে পড়ে। দূরের সারি সারি তালগাছগুলো কালো শরীর ইটভাটায় শ্রম বেচতে আসা মানুষগুলোর রোত।"

মেদিনীপুরের গ্রাম এলাকায় নাটক দেখার সুযোগ নেই। নাটক ব্যাপারটাও তেমন করে বোঝে না মানুষজন। তারা জানে যাত্রা। গ্রামীণ উৎসবকে উপলক্ষ্য করে নিজেরাই যাত্রা করে। এ জন্য আলাদা করে ভাড়া আনতে হয় ফিমেল অভিনেত্রী। ড্রেস কোম্পানীর সঙ্গেই থাকে ভাড়াটে অভিনেত্রী। তাছাড়া নিজেদের পছন্দ মতো অভিনেত্রী আনা হয় ভিন গাঁ থেকে। রিহার্সালের জন্য কিছুদিন আগে থেকেই এনে রাখতে হয় তাদের। এই দরিদ্র মেয়েদের জীবিকাই অভিনয়। 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' গল্পের রাধা এমনই এক অভিনেত্রী। সে অসাধারণ অভিনয় করলেও নিরক্ষর। তাই তাকে পাঠ মুখস্থ করতে হয় শুনে শুনে। দাউদপুরের মাঠ পেরিয়ে নানকাতে সে অভিনয় করতে যায়। এই মেয়েদের অনেক সময়ই ম্যানেজার নির্ধারিত পয়সা না দিয়ে ঠকায়। আলোচ্য গল্পে গ্রামের শখের যাত্রাপালার বিভিন্ন প্রসঙ্গ এনেছেন।

রোহিনী-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বহু গুড়কল আছে। আখ থেকে গুড় তৈরী হয় এই কলগুলিতে। সাধারণত শীতকালেই তৈরী হয় গুড়। এই কাজটা খুব কষ্টের। গুড়কলের শ্রমিক গোবরার কহিনী কোঁয়াড় গল্পটি। গুড় তৈরীর নিখুঁত চিত্র প্রাসঙ্গিকভাবে ধরা আছে গল্পটিতে। "গুড় জ্বাল দেবার কষ্টটা চোখে দেখা যায় না। পাঁচ হাত লম্বা, তিন হাত চওড়া মাপের লোহার কড়াই। তাতে টগবগিয়ে ফোটে সবুজ রস। ফিটকারির ঠেলায় ফেনা ওঠে কড়া ভর্তি। গায়ে খাঁকি জামা, পরণেঢোলা খাঁকি প্যান্ট, আগুনের সামনে ঘাসমুখে দাঁড়িয়ে থাকা গোমরা। মচমচে আখ ছিবড়ে গনগনে আগুনে পড়েই পট পটর শব্দে জ্বলে ওঠে। আধলা মালাই হতে তখন গাদ তোলে গোবরা। কপালের দু'পাশ দিয়ে চুঁইয়ে নামে ঘাম। ফোলা ফোলা শিরাগুলো আরও ফুলে যায়। তামাটে মুখটা মাটির মতো নিরস হয় ক্রমশ।"

"থাবার বাইরে" গল্পে আর এক রকম জীবিকার সন্ধান পাই। তাও চিনিয়ে দেয় মেদিনীপুরকে। কেন্দীয় চরিত্র বটার জীবিকার বদ্য ছর করা। "ছর মানে" 'কামানো' — এখানে "ছর" মানে ছাঁটাই'। 'পাঁঠাকে ওরা' 'বদা' বলে এটা গ্রামীন রেওয়াজ।" পাঁঠা পিছু দুটাকা করে পারিশ্রমিক পায়। তাছাড়া আছে পাঁঠার অন্ডোকোষ। যা রান্না করে খায় বটা। 'বদা ছর্ হবে গো, বদা ছর্'— হাঁকতে হাঁকতে বটা চলে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে। "তার এই ডাক আশে পাশের গাঁগুলোতে বিশেষ পরিচিত। যার ঘরে কচি পাঁঠা আছে সে তখন খাতির করে ডেকে নিয়ে যায় তাকে। বটার তখন পাশ করা ডাক্তারের মতো সম্মান। তার পুটুলিতে আছে নতুন ব্লেডপাত। ঘষিছাই গুঁড়া আছে কাগজের ঠোঙায় আরো যে টুকিটাকি কত কী। যার পাঁঠা সে তেলাগিনা ভরে তেল দেয়। তেল না হলে শক্ত চামড়া নরম হবে কী করে। সবকিছু হাতের কাছে পেলে বটা অভ্যস্ত কায়দায়, অনায়াস দক্ষতায় কচি পাঁঠাকে শুইয়ে দেয় ঘাসে, তার দু'পায়ের নীচে তখন চাপা থাকে পাঁঠার পেছনের ঠ্যাংগুলো। তারপর চলে অস্ত্রপচার। ধার ব্লেডের ছোঁয়ায় বেরিয়ে আসে নরম মাংস পিন্ড ফিন্‌কি দেওয়া রক্ত দেখে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে ওঠে ছাগলছানা।"

'পোকাপার্বণ'' গল্পে এসেছে খোল সারানোর জীবিকা। মেদিনীপুরের গ্রামগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে খোল কীর্তন করার প্রচলন আছে। বর্তমানে কীর্তন কমে এলেও একসময় এর প্রাদুর্ভাব ছিল। তাই রমরমিয়ে চলতো খোল সার ানোর ব্যবসা। আলোচ্য গল্পে খোল সারানো, কীর্তনের নানা প্রসঙ্গ এসেছে। ''হলা বুড়ো শিল পুতাটা তুলে নিয়ে বার কয়েক বাড়ি মারল খোল মুড়িতে, তারপর ঝামা ইটে তালা ঘষে বোল তুলল হাতের চাপড়ে। কেঁপে উঠল চামড়ার তাল া, তালার মাঝে চিমটে বেঁধে ফেলল হলাবুড়ো, তারপর লারানীকে বলল, মা জননীরে, গা দেখি সেই গানটা?'' ব্রজলাল সাতটা খোল সারাতে এসেছিল হলাবুড়ার কছে। কারণ গ্রামের মিটিং-এ ঠিক হয়েছে ধানের পোকা ঠেকাতে হরি নামের দল সকাল-সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে কীর্তন করে বেড়াবে।— এভাবে নানা গ্রাম্য সংস্কার এসেছে এগল্পে।

চুরি — এই জীবিকা সর্বত্রই রয়েছে। কিন্তু কোন কোন চুরি চিনিয়ে দেয় গ্রাম সমাজকে। বিশেষত মেদিনীপুরের গ্রাম সম াজকে। 'গোলাপগাছ' গল্পের গুলাপ রাতের অন্ধকারে গৃহস্থের গোয়ল থেকে গচুরি করে হাটে বিক্রী করে। অন্ধকার ভেজ া বাঁশ জঙ্গলে অপেক্ষা করা থেকে গোয়াল থেকে গ চুরি করার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে এগল্পে। ''..... ধবলী গাইটাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সে যখন পাকড়া গাইটার রাশ খুলছিল তখনই পাকড়ার বিকট ডাকে জেগে উঠল মাহিন্দার। গুলাপ তখন তীরের মতো ছিটকে চলে এসেছে গোয়াল ঘরের বাইরে।'' গ চুরি ছাড়াও এ গল্পে রয়েছে বঁড়শিতে আরশোলা গেঁথে মোরগ চুরির প্রসঙ্গ, ধানের ক্ষেতের শ্যালো-মেশিন-পাইপ চুরির প্রসঙ্গ।

গত শতকের নববই-এর দশকের প্রথমদিকে সারা মেদিনীপুর জেলায় শু হয়েছিল সাক্ষরতা অভিযান। এরই পটভূমিতে লেখা 'গর্ভ

দাও' গল্পটি। সরকারি আনুকূল্যে কবিগায়করাও গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছে এই অভিযানের কথা। এই গল্পে ভরত তার গানের মাধ্যমে প্রচার করে সাক্ষরতার কথা ঃ — ''চোখ থাকিতে অন্ধ যাঁরা / কৃষক মজুর সর্বহারা / ঘুচবে কালো, ফুটবে আলো / সবার হবে দৃষ্টিদান, / সাক্ষরতার অভিযান। / চলো ভাই পড়াই / কিছু করে দেখাই.....'। গ্রামপ্রধ ানের বক্তৃতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য — ''চলো পড়াই, কিছু করে দেখাই.....''। সাক্ষরতার অভিযান চলছে চলবে। ভরত দ াসের মতো কবিরা গ্রাম-গঞ্জে সাক্ষরতার সুফল গানের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলবে। ভারতবর্ষের স্ব াধীনতায় চারণকবি মুকুন্দ দাসের ভূমিকা কি কম ছিল? 'ভেঙে ফেল রেশমি চুড়ি' এখনও আমাদের মন থেকে মোছেনি, কোনদিনও মুছবে না। — আমাদের ভাগ্য যে মেদিনীপুরের এই সোনার মাটিতে বিদ্যাসাগর জন্মেছিল। আমরা তাঁর অ াদর্শ থেকে চ্যুত হব না। তাই ভাইসব, মা সকল দরাজ গলায় বলুন, বিদ্যাসাগরের মেদিনীপুর / নিরক্ষরতা হবে দূর টীক ায় যাবে হুপিং কাশি/শিশুর মুখে ফুটবে হাসি। মনে রাখবেন — সাক্ষরতার অপর নাম সচেতনতা ও সক্ষমতা।

রেল শহর খড়গপুরে বিভিন্ন মানুষের বসবাস। এই কস্‌মোপলিটন মাটিতে প্রচুর রেল বস্তি রয়েছে। খড়গপুর রেল বস্তি কোয়াটারে ওয়ার্কসপ প্রভৃতির পটভূমিতে অনেক গল্প লিখেছেন অনিল। যেমন 'পায়রা' 'একটা মানুষ একা' 'প্রতিত্রিয়া' প্রভৃতি গল্প। বস্তিবাসী মানুষদের জীবনচিত্র সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে 'প্রতিত্রিয়া' এবং 'সাদাজীবন' গল্পে। 'আকাশ মাটির খেলা' গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে খড়গপুর প্ল্যাটফর্মের রাত্রিকালীন দৃশ্য।

আলোচিত গল্পগুলি ছাড়াও অনিলের বহু গল্পের পটভূমি পরিবেশ বিষয় মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল — মানুষজন। সাধারণ ভাবে অন্ত্যজ মানুষজন। অন্ত্যজ মানুষদের নির্ভরযোগ্য দলিল অনিল ঘড়াই এর এই গল্পগুলি।

তিন

মেদিনীপুরের ভিন্ন একটি অঞ্চল ধরা পড়েছে বন মাইতির গল্পে। এই অঞ্চল দাঁতন ও সংলগ্ন এলাকা। জেলার দক্ষিণ-

পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত দাঁতন। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই এক দিক দিয়ে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা। অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব রেল, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের প্রবেশ পথ কৃষিপ্রধান এই এলাকায় হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও অনার্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষের বাস। বৈচিত্র্যময় এ হেন দাঁতন অঞ্চলের বিচিত্ররূপ ফুটে উঠেছে বণের গল্পে।

'সুবর্ণরেখার মানুষ' — নামেই বোঝা যায় গল্পের বিষয়; মানুষগুলির সুবর্ণরেখা লগ্নতা। এলাকার মানুষজনের জীবন-যাপনের সঙ্গেনিবিড়ভাবে যুক্ত সুবর্ণরেখা। তার জল পলিতে উর্বর হয় ধানের জমি। এই প্রাণদায়িনী নদীই আবার কেড়ে নেয় ঘরবাড়ী ফসলের ক্ষেত। গত কয়েক বছরের পশ্চিমঘেঁষা স্রোতে প্রায় শেষ হয়ে গেছে মাকুড়িয়া গ্রাম।" এ বছর আবার পুবে ঘুরল। বেলামলা, নৈকুলীবচাঁ, বাঘড়া — এবার এদের পালা।" বছরের অধিকাংশ সময়েই জল থাকে না সুবর্ণরেখায়। কিন্তু বর্ষাকালে তার এক রূপ। এপারে দৃষ্টি পৌঁছায় না। "ক্ষ্যাপা হাতির গর্জন, লাল ঘোলা জলে ঢেউ এর মাতন কল্‌কল ছল্‌ছল্‌। সেদিনের হাড় জিরজিরে নদীর আজ বিশ পঁচিশের নারীর ঢলঢলে শরীর। জলের টানই বা কী। পাথরের চাঙড়ও তার টানে খোলাকুচি।" সুবর্ণরেখার রাক্ষুসী বন্যা এলাকার মানুষদের ঘরছাড়া করে। তারমধ্যে কেউ কেউ ভালোবাসার মোহে ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকে। যেমন, এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাখাল। বন্যার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলে, "এ ভিটা ছাড়িকি কাঁহ যাবা নি ভাবিটিয মরলে মরবা, বাঁচলে বাঁচবা।" দেখতে দেখতে জল ওঠে দাওয়ায়। তবুও ঘর ছাড়ে না। মুড়ির টিন জলের কলসী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় স্ত্রীর সহযোগিতায় ঘরের চালে তোলে। স্ত্রী-সন্তান গবাছুর নিয়ে এই জলের মাঝখানে যেন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। রাখালের স্ত্রী পূর্মিমার মনে পড়ে দাঁতনের বোর্ডিং এ থাকা পরশুরামের কথা। বন্যার জল সেখানে পৌঁছায় না জেনে নিশ্চিত হয়। ছেলের ভবিষ্যৎ সাফল্যের আশায় বঁাচার প্রেরণা পায় এই দুদিনে। রাখাল বলে, "আর মাত্র দু'বছর। তারপর, তুহ অফিসারের মা, আর আমি অফিসারের বাবা।" এ গল্পে সুবর্ণরেখা মূক নদী হয়েই থাকে নি। সে রক্তমাংসের জীবন্ত নারী।

শহরের পটভূমিতে লেখা 'নদীর দিকে" গল্পে ফিরে এসেছে সুবর্মরেখা ও তীরবর্তী গ্রাম। হেমন্ত মন্দাকিনীর ঘরসংসার ছিল সুবর্ণরেখার তীরে, একটা গ্রামে। "গনগনে রোদের নীচে লাঙলের বাঁট দুহাতে চেপে ধরে" মা ধরিত্রীকে ঋতুমতী করে তুলত হেমন্ত। মন্দাকিনী তার জন্য ছেলের হাতে পাঠিয়ে দিত শাকের ভাজা আর পান্তা। "বিউলির ডাল, কুমড়ো-পুঁইয়ের ঘন্ট, কাঁচা আম দিয়ে রাঁধা মৌরলা মাছের টক আর গরম গরম ভাত বেড়ে দিয়ে তালপাতার পাখায় হাওয়া করতে করতে স্বামীকে খাওয়াতো। "কোলে একটা বাচচাকে নিয়ে একহাতে উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে অপর হাতে পিছ দিয়ে হাঁড়ির গরম বালিতে চাল নেড়ে নেড়ে মুড়ি ভাজতো"। কিন্তু তাদের এই সুখের নীড় ভেঙে দেয় সুবর্ণরেখা। কৃষি নির্ভর হেমন্তের শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু চলে যায় সুবর্ণরেখার গ্রাসে। বাধ্য হয়েই স্বপ্নের গ্রাম ছেড়ে তাদের আসতে হয় শহরে। সুবর্ণরেখার করাল গ্রাসের শিকার হযেও তাদের কোনও অভিমান নেই। যে সুবর্ণরেখা তাদের সর্বস্বান্ত করেছে, সেই সুবর্ণরেখার করাল স্মৃতি তারা গোপনে লালন করতে ভালোবসে। সুবর্ণরেখার হিমজলে গলা ডুবিয়ে হঁাসের মতো সাঁতারের সুখ স্মৃতিতে বুঁদ হয়ে থাকে শহরবাসী মন্দাকিনী, লোকে তাকে 'মিথ্যাবাদিনী' বলে জানা সত্ত্বেও সে সবার কাছে সুবর্ণরেখার গল্প করে। গল্প করে সুবর্ণরেখার তীরে তার খড়ে ছাওয়া গোবরে নিকানো মাটির ঘরের। আদি সংসারের। মন্দাকিনী আর এক মানুষ।

'প্রথম সুবর্ণরেখা' দুই আদিবাসী যুবক-যুবতীর প্রেমের গল্প। যুম্‌না তার পুষ বীরাকে দেখেছিল সুবর্ণরেখার পাড়ে। হৃদয়ের অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল এই সুবর্ণরেখায়। সুবর্ণরেখার টানেই যুমনা বারবার যেত দিদির বাড়িতে। "সুবর্ণরেখার জলে গলা ডুবিয়ে সাঁতার কাটতে, নাইতে কী যে মজা। বালির উপর আয়নায় মতো কীগুলো যেন চিক্‌ চিক্‌ করে বাহার ছড়ায়। অভ্‌ভ্র না কী নাম বলে শুনেছে সে। ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে নাকি সুবর্ণরেখা বয়ে নিয়ে আসে সেই অভ্‌ভর। যুমনী কত মজাটাই না পেতো সেই অভ্‌ভর কুড়াতে গিয়ে। "সুবর্ণরেখার প্রতি ভালোবাসাই হয়তো যুম্‌নীকে প্রাণিত করেছে সুবর্ণরেখার মানুষ বীরাকে ভালোবাসতে।

দাঁতনে প্রতি মঙ্গলবার হাট বসে। তার নাম কালীচন্ডীর হাট। এ গল্পে সে প্রসঙ্গও এসেছে। এই হাটেই দেখা করত ভিন গাঁয়ের বীরা-যুমনী। মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম পুকুর শরশঙ্কা দাঁতনের দু কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। পৌষ সংক্রান্তিতে দু'দিনের জন্য মেলা বসে এখানে। প্রাসঙ্গিকভাবে গল্পে এই মেলার কথা এসেছে। আদিবাসীদের আঞ্চলিক দেবতা 'কালিয়ষঁড়''হাপড়ামকো' ও 'চাঁদবোঙা' র প্রসঙ্গ এসেছে। এই দেবতাদের কাছে যুম্নী কামনা করেছে বীরার সুস্থতা, বা বীরাকে পাওয়ার দুর্বার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। 'মকর পরব' আদিবাসীদের উল্লেখযোগ্য একটা উৎসব। এসময় তারা দিনরাত নেশা করে — হাঁড়িয়া খায় — মহুলিয়া খায়। মাদলের " ধিতিং তাং, ধিতিং তাং শব্দে " সরগরম থাকে এলাকা। স্ত্রী পুষে গান গেয়ে নাচে — " রে রেইরে, রে রেইরে, রে রেরে হোঃ/কড়া নাকো জানামেন হো মড্দা ঝর্ণা দ্রাহা দাঃ খ্ন হোঃ।" আদিবাসীদের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব বাঁধনা পরবের প্রসঙ্গও এসেছে — "বাঁধনা পরব গর পূজা — গর নাচন। সারাদিন সব কাজ কাম বন্ধ। পরবের দিন। নাচ গানের দিন। নেশা করার দিন! যুম্নীর দিদির ঘরের সাইতে জববর গর নাচ হয় বাঁধনা পরবে। দামড়িয়া গগুলান সারসার বাঁধা থাকে বাঁশের খুঁটিতে। গ পূজার পর তাদের নাচনের পালা। মাদল বাজিয়ে, পটকা ফাটিয়ে রাগানো হয় গকে। যে গ যত তেজী, সে গ নাচনে তত মজা। মেয়া মরদ সব হাঁড়িয়া খেয়ে টড় হয়ে সেদিন জড়ো হয় গর নাচের আসরে মাদলের বাজনা শুনে, পটকার আওয়াজ শুনে, গগুলান ক্ষ্যাপে ওঠে। আবার যখন নাচনদার লাল শালু দেখায় তখন তাদের ক্ষ্যাপা মাথা রাগে আগুন হয়ে যায়। গগুলান শিং বাগিয়ে ছুটে আসে নাচনদারকে গুঁতাতে। আর জোয়ান সাঁওতাল মরদ হাতে চাংড়ার হরতা নিয়ে একবার গর কাছে এগিয়ে যায় আর গ গুঁতাতে এলেই ছিটকে সরে আসে দূরে।" আদিবাসীদের বাড়ি ঘর দোরের বর্ণনা ও করেছেন বণ। শুয়োর-মুরগী মানুষ পাশাপাশিই বসবাস করে। সাবানের অভাবে কাঁকড়া মাটি দিয়ে মাথা ঘসে। গল্পে ব্যবহৃত গানগুলি আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় নিদর্শন হলেও ব্যবহৃত সংলাপগুলি আদিবাসীদের মৌলিক ডায়ালেক্ট নয়, এই সংলাপগুলিতে দাঁতন এলাকার আঞ্চলিক ডায়ালেক্ট মিশে গেছে। যাতে আদিবাসীদের মৌলিক শব্দ যেমন আছে, তেমনি আছে দাঁতনের কথ্য শব্দ।

দাঁতনের প্রান্ত বারবার ধান খেতের বুক চিরে রেললাইন। বিকেল বেলা নির্জনতা খুঁজতে, চুপচাপ বসে থাকতে বা প্রিয়জনের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে রেল লাইনকে বেছে নেয় কেউ কেউ। যেমন 'চোর পুলিশ খেলা' গল্পে মতি ও বণ। ট্রেন লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মতি প্রিয় বন্ধু বণকে বলেছে তার ক্ষোভ-হতাশা-চিন্তা-ভাবনার কথা।

শুধু নির্জনতা খুঁজতে এখানে আসে না মানুষ। কেউ কেউ আসে জীবিকার সন্ধানে। বেঁচে থাকার রসদ খুঁজতে। এমনই এক জীবিকার কথা বলেছেন বণ তাঁর 'অন্ধকার এবং গল্পে'। রেললাইনের ধারে যাদের বসত্, তাদের অনেকেই এই জীবিকা — এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এ কাজ হল কয়লা ধরার কাজ। একটা কঞ্চি বা ডালে দু'টাকা পাঁচ টাকার নোট বেঁধে কঞ্চিটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ফায়ারম্যান কঞ্চিটা টেনে নিয়ে কয়লার চাঙর ফেলে দেয় কয়েকটা। এই কয়লা বিক্রি করে সংসার চলে তাদের। সূর্য পাত্র বা সুরিয়া পাতর একা নয়, পুরো পাত্র পড়াটাই বেঁচে আছে এই কয়লা ধরার কাজ করে। সুরিয়া এই কাজে একটা পা হারিয়েছে। "সেদিনও কয়লা ফেলতে ফেলতে ছুটে আসছিল গাড়িটা। ধনিয়া টাকা গোঁজা ডালটা বাড়িয়ে দিয়েছে, কয়লা পড়ছে। বেলচা দিয়ে কয়লার চাঙরগুলো ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে ফায়ারম্যান। এবার তার পালা। সে ধরে আছে ডালটা। ইঞ্জিনটা পৌঁছে গেছে তার কাছে একদম। আর সেই মুহূর্তেই প্রায় আধমন খানেকের একটা চাঙড় নেমে এসেছিল তার সামনের দিকে বাড়ানো বাম পাটার ওপর।" একটা পা হারিয়েও পেটের দায়ে হারাতে পারেনি পুরোনো পেশা। বর্তমানে কয়লা ইঞ্জিনগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, বন্ধ হয়েছে এই কয়লা ধরার কাজও। এই গল্প যে সময়ের পটভূমিতে লেখা, সে সময় ডিজেল ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। পাশাপাশি কয়লা ইঞ্জিনও ছিল কিছু। দক্ষ সুরিয়া রেলের পাতে কান পেতে বুঝতে পারত বহুদূর থেকে আসা ট্রেনটির কয়লা ইঞ্জিন বা ডিজেল ইঞ্জিন। 'ডিজেল ইঞ্জিনের মেয়েলিসুর'আর কয়লা ইঞ্জিনের 'বাজখাঁই শব্দ — পুষ পুষ'। কয়লা ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে শুনে সে দুশ্চিন্তায় পড়ে, "তার বৌ-ছেলে মেয়ে কে সে কী খেতে দিবে? সারা পাতর পাড়াটারই বা কী হবে?" কৃষিনির্ভর মেদিনীপুর জেলার কৃষক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, জীবন-যাপনের খুঁটিনাটি ধরা পড়েছে — 'জলের শব্দ' গল্পে। কৃষি ব্যবস্থার প্রাথমিক উপাদান জল। সাধারণ ভাবে বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয় জলের জন্য। তাই বর্ষার শুতে বৃষ্টি না হলে কৃষকদের দুশ্চিন্তার অন্ত

থাকে না। যেন মৃত্যুভয় গ্রাস করে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পরেশের "বর্ষার কথা মনে পড়ে গেলে গলায় ভাতের দলা আটকে যায়। কী করে চালাবে সংসারটাকে? ধান হবে এ বছর? পান গাছ কি বেঁচে বর্তে থাকবে শেষ পর্যন্ত? মাদুর কাঠিগুলো ডগা শুকা দিতে শু করে দিয়েছে। এক ছিঁচ জল দেওয়া যায় না?" বৃষ্টি কম বেশির উপর শহরের মানুষদের বাঁচা-মরা নির্ভর করে না; কিন্তু গ্রামের কৃষকদের করে। মেদিনীপুরে ধান-পান ছাড়াও মাদুর কাঠির চাষ হয় প্রচুর। এই চাষের বর্ণনা — "মাদুরকাঠির ডগা শুকিয়ে যেতে শু করেছ। দশকাঠা জমির মাদুর কাঠি মেরে কেটে হাজার দুয়েক টাকা আসার কথা। এত কষ্ট করে ঘাস বাছল, পাঁক ছড়ালো, টাকা ধার করে পেড়িয়া মারল, ইউরিয়া দিল। এতদিনে গাছ বুক সমান উঁচু হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ সেই গাছ হাঁটু ছড়ায়নি — মরতে বসেছে আজ। কোন রকম করে যদি একটা বাতান্ জল দেওয়া যেত! এখনও গাছ যা আছে দেড়শ টাকা মন দর পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে জল পাওয়া যায় কোতায়? "গ্রামের গ্রীষ্মকালীন চেহারাও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এ গল্পে" জ্যাষ্ঠি মাস শেষ হতে চলল, মাঠে ফাল ফোঁড়া হল না। মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির, খানা-খন্দের জল শুকিয়েছে সেই কবে। বড়বড় পুকুরগুলো পর্যন্ত তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মাটির নীচেও জলের লেয়ার গেছে নেমে। আর সেই জন্যই নাকি টিউকলগুলোতে চিরিক করে বালিগোলা জল এক আধটু উঠছে কি উঠছে না। সেলো ফেল মেরে যাচ্ছে। ..... এতদিনে লাগানি জল হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ সময় বয়েই যাচ্ছে, জমি তৈরী হচ্ছে না। বীজতলা পর্যন্ত পড়লো না। আর পাঁজিতে কিনা লেখা আছে — মাঠ ভর্তি ফসল, রোগ নারা থাকবে না দেশে, মানমুষ সুখে-আাদে বেঁচে বর্তে থাকবে। এ বছরের মতো এতো ভালো গ্রহের যোগাযোগ নাকি ইদানিং কালের মধ্যে হয়নি।" গ্রামের মানুষদের পঞ্জিকায় বিশ্বাস যেন অস্তিত্বে মিশে আছে। পঞ্জিকার অাগাম নির্দেশের সঙ্গে বাস্তব না মিললেও বিশ্বাস টলে না সহজে। তাই ঝল্কেরের মন্দিরে যজ্ঞ করার পরও বৃষ্টি না নামলে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক হয় — "পাঁচ গাঁ মিলে যাগ করবে। পাঁচমন ঘি পুড়বে, পাঁচশ বেলপাতা, পাঁচটি কালো গাইয়ের দুধ, পাঁচজন সতী নারী উপোশ করে পাঁচ পুকুরের জল এনে শিবের মাথায় ঢালবে। পাঁচজন সাত্ত্বিক পন্ডিত পাঁচ প্রহর ধরে পাঁচ সহস্র শ্লোক পড়বে।" কৃষি সংক্রান্ত প্রচলিত প্রবাদ এ গল্পে এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে "আম দেখায় ধান / তেঁতুল দেকায় বান" বা "ধন্য রাজার ধন্য দেশ / যদি বর্ষে মাঘের শেষ ইত্যাদি। দরিদ্র কৃষক জীবনের কিছু জীবনের কিছু পারিবারিক দৃশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। যেমন, — পরেশ খেঁদির মুখে মাঝে মধ্যে এক গ্রাস করে ভাত গুঁজে দিয়েই নিজে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। যেন চিবোবার ফুরসোত নাই। গলায় ভাত আটকে গেলে ঘটি থেকে দু-এক ঢোঁক জল নিয়ে তা চালান করে। গোটা দুয়েক পদ তরকারি, তা-ই যেন অমৃত। নিমেষে থালার ভাতগুলো ফুঁকে দেয় সে।" সকলের খাবার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে — সেটাই জোটে বউদের কপালে। কোনো তরকারি কড়াইতে একটু লেগে থাকে, কোনোটাই বা থাকে না। পরেশের বউ পার্বতীর খাওয়ার দৃশ্যে তারই পরিচয় মেলে। প্রতিদিন বাজার করবার রীতি ও সুযোগ নেই গ্রামে। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে হাট বসে। সেদিন বাড়ির ছোটোছেলে মেয়েদের ও আনন্দের দিন। কারণ হাট ফেরত বাবার কাছে পাবে চানাচুর বিস্কুট লজেন্স। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার বন্ধ্যাকরণ করলে টাকা দিত। গ্রামের বউয়েরা অনেক সময় এই টাকার লোভে বন্ধ্যাকরণ করে। এই প্রসঙ্গও এসেছে গল্পে। বন্ধ্যাকরণ করে পাওয়া টাকা পার্বতীর নিজস্ব সম্পদ। মেদিনীপুর গ্রামীন কৃষক জীবনের জীবন্ত দলিল এগল্প।

সরকারী জনগণণা অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের কাছে কতটা হাস্যকর ও মূল্যহীন তার পরিচয় পাই 'আদম সুমারী' গল্পে। নিজের নামটাও সঠিকভাবে বলতে পারেনা সুখিয়া। বয়স ও না। আসলে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজনই নেই এগুলি জানার।

বেশ কয়েক বছর আগে সরকারি উদ্যোগে শু হয়েছিল সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প। যার ফলে গ্রামগুলোতে আম কাঁঠালের জায়গায়আকাশবানি য়ুক্যালিপটাস গাছের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। যে গাছে শাখা-প্রশাখা তেমন করে না থাকায় পাখিও বসেনা। 'অ' গল্পে গ্রামের এই ছবি ধরা পড়েছে। আলোচিত গল্পগুলি ছাড়া ও বণ মাইতির আরও গল্পের পটভূমি বিষয় মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল। এর অধিকাংশ দাঁতন ও সংলগ্ন এলাকা। এই এলাকা তাঁর নিজস্ব এলাকা। এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা-সভ্যতা সংস্কৃতির ছবি এঁকেছেন বণ। অঞ্চল সম্পর্কে নিবিড় অভিজ্ঞতা থাকায় এসকল ছবিগুলো

জীবনরসস্নিগ্ধ, ছবি না বলে চলচ্ছবি বলা ভালো। চরিত্রগুলির ব্যবহৃত সংলাপও দাঁতন অঞ্চলের ডায়ালেক্ট । যে ভাষা বণের বাল্য-কৈশোরের মুখের ভাষা। ছবি-চরিত্র সংলাপ কোনোটাই বণের গল্পে কৃত্রিম হয়নি।

চার,

মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু জীবনযাপনের রীতিনীতি সমাজ প্রতিবেশ সভ্যতা সংস্কৃতি আলোচ্য দুই লেখকের গল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। চরিত্র বিকাশ ও কাহিনী বিস্তারের ক্ষেত্রে অঞ্চল একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সেদিক থেকে এই লেখাগুলিকে আঞ্চলিক বলতে পারি। কিন্তু স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করেছে। আঞ্চলিক সাহিত্যের সঠিক সংজ্ঞায় এগুলিকে চিনে নেওয়া গেলেও বেঁধে রাখা যায় না। এই লেখাগুলিতে একটা জোর আছে; যে জোরের কাছে সহজেই নতজানু হতে হয়। সেই জোর হল — অভিজ্ঞতার জোর। সে দিক থেকে সাহিত্য হয়েও এগুলি মেদিনীপুরের বিশ্বস্ত দলিল — সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com